ক্বাফ

৫০

নামকরণ

সূরার প্রথম বর্ণটিই এর নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা ق (ক্বাফ) বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ঠিক কোন্ সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায় নবুওয়াতের তৃতীয় সন থেকে শুরু করে পঞ্চম সন পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি সূরা আন'আমের ভূমিকায় এ যুগের বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করেছি। ঐ সব বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ রেখে বিচার করলে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় কাফেরদের। বিরোধিতা বেশ কঠোরতা লাভ করেছিল। কিন্তু তখনো জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু' ঈদের নামাযে এ সূরা পড়তেন।

উম্মে হিশাম ইবনে হারেসা নাম্নী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশিনী এক মহিলা বর্ণনা করেছেন যে, প্রায়ই আমি নবীর (সা) মুখ থেকে জুমআর খুতবায় এ সূরাটি শুনতাম এবং শুনতে শুনতেই তা আমার মুখস্ত হয়েছে। অপর কিছু রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বেশীর ভাগ ফজরের নামাযেও এ সূরাটি পাঠ করতেন। এ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবীর (সা) দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। সে জন্য এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌছানোর জন্য বারবার চেষ্টা করতেন।

সূরাটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এর গুরুত্বের কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গোটা সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়ায্যমায় দাওয়াতের কাজ শুরু করলে মানুষের কাছে তাঁর যে কথাটি সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত মনে হয়েছিল তা হচ্ছে, মৃত্যুর পর পুনরায় মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদেরকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। লোকজন বলতো,

এটা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ হতে পারে বলে বিবেক–বুদ্ধি বিশ্বাস করে না। আমাদের দেহের প্রতিটি অণু–পরমাণু যখন মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাবে তখন হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐসব বিক্ষিপ্ত অংশকে পুনরায় একত্রিত করে আমাদের এ দেহকে পুনরায় তৈরী করা হবে এবং আমরা জীবিত হয়ে যাব তা কি করে সম্ভব? এর জবাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও তা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, বিবেক–বুদ্ধি বিরোধী মনে করো কিংবা মিথ্যা বলে মনে করো তাতে কোন অবস্থায়ই সত্য পরিবর্তিত হতে পারে না। সত্য তথা অকাট্য ও অটল সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের দেহের এক একটি অণু–পরমাণু যা মাটিতে বিলীন হয়ে যায় তা কোথায় গিয়েছে এবং কি অবস্থায় কোথায় আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন। বিক্ষিপ্ত এসব অণু–পরমাণু পুনরায় একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তোমাদেরকে ইতিপূর্বে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটি ইংগিতই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে তোমাদের এ ধারণাও একটি ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এখানে তোমাদেরকে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কারো কাছে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও সরাসরি তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে এমনকি তোমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠা সমস্ত ধারণা ও কল্পনা পর্যন্ত অবহিত আছেন। তাছাড়া তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের প্রত্যেকের সাথে থেকে তোমাদের সমস্ত গতিবিধি রেকর্ড করে সংরক্ষিত করে যাচ্ছে। যেভাবে বৃষ্টির একটি বিন্দু পতিত হওয়ার পর মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুর বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট সময় আসা মাত্র তাঁর একটি মাত্র আহবানে তোমরাও ঠিক তেমনি বেরিয়ে আসবে। আজ তোমাদের বিবেক–বুদ্ধির ওপর গাফলতের যে পর্দা পড়ে আছে তোমাদের সামনে থেকে সেদিন তা অপসারিত হবে এবং আজ যা অস্বীকার করছো সেদিন তা নিজের চোখে দেখতে পাবে। তখন তোমরা জানতে পারবে, পৃথিবীতে তোমরা দায়িত্বহীন ছিলে না, বরং নিজ কাজ–কর্মের জন্য দায়ী ছিলে। পুরস্কার ও শাস্তি, আযাব ও সওয়াব এবং জান্নাত ও দোযখ যেসব জিনিসকে আজ তোমরা আজব কল্প কাহিনী বলে মনে করছো সেদিন তা সবই তোমাদের সামনে বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে। যে জাহান্নামকে আজ বিবেক–বুদ্ধির বিরোধী বলে মনে করো সত্যের সাথে শত্রুতার অপরাধে সেদিন তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে। আর যে জান্নাতের কথা শুনে আজ তোমরা বিস্মিত হচ্ছো মহা দয়ালু আল্লাহকে ভয় করে সঠিক পথে ফিরে আসা লোকেরা সেদিন তোমাদের চোখের সামনে সেই জান্নাতে চলে যাবে।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ﴿٤﴾

ক্বাফ, মহিমান্বিত কল্যাণময় কুরআনের[১] শপথ। তারা বরং বিস্মিত হয়েছে এ জন্য যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে।[২] এরপর অস্বীকারকারীরা বলতে শুরু করলো এটা তো বড় আশ্চর্যজনক কথা, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে মিশে যাব (তখন কি আমাদের উঠানো হবে)? এ প্রত্যাবর্তন তো যুক্তি–বুদ্ধি বিরোধী।[৩] অথচ মাটি তার দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা। আমার কাছে একখানা কিতাব আছে। তাতে সবকিছু সংরক্ষিত আছে।[৪]

১. مجيد শব্দ আরবী ভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, উচ্চ পদের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মহান এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। দুই, দয়ালু, অধিক দানশীল এবং অতি মাত্রায় উপকারকারী। কুরআনের জন্য এ শব্দটি দু'টি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মহান এ দিক দিয়ে যে, তার মোকাবিলায় দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থই পেশ করা যেতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যিক মূল্যবোধের বিচারেও তা মু'জিযা আবার শিক্ষা ও জ্ঞানের বিচারেও তা মু'জিযা। কুরআন যে সময় নাযিল হয়েছিল সে সময়েও মানুষ কুরআনের বাণীর মত বাণী বানিয়ে পেশ করতে অক্ষম ছিল এবং আজও অক্ষম। তার কোন কথা কখনো কোন যুগে ভুল প্রমাণ করা যায়নি এবং যাবেও না। বাতিল না পারে সামনে থেকে এর মোকাবিলা করতে না পারে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে পরাজিত করতে। কুরআন অধিক দাতা এ দিক দিয়ে যে, মানুষ তার থেকে যত বেশী পথ–নির্দেশনা পাওয়ার চেষ্টা করে সে তাকে ততটাই পথনির্দেশনা দান করে এবং যত বেশী তা অনুসরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সে ততই বেশী লাভ করতে থাকে। এর উপকার ও

কল্যাণের এমন কোন সীমা নেই যেখানে পৌছে মানুষ এর মুখাপেক্ষী না হয়েও পারে কিংবা যেখানে পৌছার পর এর উপকারিতা শেষ হয়ে যায়।

২. এ আয়াতাংশটি অলংকারময় ভাষার একটি অতি উত্তম নমুনা। অনেক বড় একটি বিষয়কে এতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। যে ব্যাপারে কুরআনের শপথ করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়নি। এ বিষয়টি উল্লেখ করার পরিবর্তে মাঝে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা রেখে পরবর্তী কথা 'আসলে' বা 'বরং' শব্দ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। কেউ যদি একটু চিন্তা-ভাবনা করে এবং যে পটভূমিতে একথা বলা হয়েছে সেদিকেও খেয়াল রাখে তাহলে শপথ ও 'বরং' শব্দের মাঝে যে শূন্যতা রেখে দেয়া হয়েছে তার বিষয়বস্তু কি তা সে জানতে পারবে। এখানে মূলত যে ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে তাহচ্ছে, মক্কাবাসীরা কোন যুক্তিসংগত কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মানতে অস্বীকার করেনি বরং একেবারেই একটি অযৌক্তিক কারণে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তাদের স্বজাতির একজন মানুষ এবং তাদের নিজেদের কওমের এক ব্যক্তির আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী হয়ে আসা তাদের কাছে অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অথচ, বিস্ময়ের ব্যাপার হতে পারতো যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে তাদের সাবধান করার কোন ব্যবস্থা না করতেন, কিংবা মানুষকে সাবধান করার জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে পাঠাতেন অথবা আরবদের সাবধান করার জন্য কোন চীনাকে পাঠিয়ে দিতেন। তাই অস্বীকৃতির এ কারণ একেবারেই অযৌক্তিক। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ নিশ্চিতভাবেই একথা মানতে বাধ্য যে, বান্দাদেরকে হিদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সেটা হবে এভাবে যে, যাদের মধ্যে সাবধানকারীকে পাঠানো হয়েছে সে তাদেরই একজন হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন ? এ বিষয়টির মীমাংসার জন্য আর কোন সাক্ষের প্রয়োজন নেই, যে মহান ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণময় কুরআন তিনি পেশ করছেন সেটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে কুরআনের শপথ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আল্লাহর রসূল এবং তাঁর রিসালাত সম্পর্কে কাফেরদের বিস্ময় অহেতুক। কুরআনের "মজীদ" হওয়াকে এ দাবীর প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

৩. এটা ছিল তাঁদের দ্বিতীয় বিস্ময়। তাদের প্রথম ও প্রকৃত বিস্ময় মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ছিল না, বরং তা ছিল এ বিষয়ে যে, তাদের নিজেদের কওমের এক ব্যক্তি দাবী করে বসেছে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাবধান করার জন্য এসেছেন। তাছাড়া তারা আরো বিস্মিত হয়েছে এ কারণে যে, তিনি যে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করছিলেন তা হচ্ছে, সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করা হবে, তাদেরকে একত্রিত করে আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে এবং সেখানে তাদের সমস্ত কাজ-কর্মের হিসেব নিকেশের পর পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

৪. অর্থাৎ একথা যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধিতে না ধরে তাহলে তা তাদের বিবেক-বুদ্ধির সংকীর্ণতা। তাদের বিবেক-বুদ্ধির সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহর জ্ঞান ও

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞

এসব লোকেরা তো এমন যে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যা মনে করেছে। এ কারণেই তারা এখন দ্বিধা–দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছে।[৫]

আচ্ছা,[৬] এরা কি কখনো এদের মাথার ওপরের আসমানের দিকে তাকায়নি? আমি কিভাবে তা তৈরী করেছি এবং সজ্জিত করেছি।[৭] তাতে কোথাও কোন ফাটল নেই।[৮] ভূপৃষ্ঠকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, তাতে পাহাড় স্থাপন করেছি এবং তার মধ্যে সব রকম সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি।[৯] এসব জিনিসের সবগুলোই দৃষ্টি উন্মুক্তকারী এবং শিক্ষাদানকারী ঐ সব বান্দার জন্য যারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আমি আসমান থেকে বরকতপূর্ণ পানি নাযিল করেছি। অতপর তা দ্বারা বাগান ও খাদ্য শস্য উৎপন্ন করেছি। তাছাড়া থরে থরে সজ্জিত ফলভর্তি কাঁদি বিশিষ্ট দীর্ঘ সুউচ্চ খেজুর গাছ।

কুদরতও সংকীর্ণ হতে হবে তা নয়। এরা মনে করে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী অসংখ্য মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ যা মাটিতে মিশে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বিক্ষিপ্ত হয়ে মিশে যাবে তা একত্রিত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ঐ সব দেহাংশের একেকটি যেখানে যে অবস্থায় আছে আল্লাহ তা'আলা তা সরাসরি জানেন, তাছাড়া আল্লাহর দফতরে তার পূর্ণাংগ রেকর্ডও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি ক্ষুদ্র অণুও তা থেকে বাদ পড়ছে না। যখন আল্লাহর নির্দেশ হবে সেই মুহূর্তেই তাঁর ফেরেশতারা উক্ত রেকর্ড দেখে একেকটি অণুকে খুঁজে বের করবে এবং সমস্ত মানুষ যে দেহ নিয়ে দুনিয়াতে কাজ করেছিল সেই দেহ তারা পুনরায় বানিয়ে দেবে।

আখেরাতের জীবন যে কেবল দুনিয়ার জীবনের মত দৈহিক জীবন হবে তাই নয় বরং দুনিয়াতে মানুষের যে দেহ ছিল আখেরাতেও প্রত্যেক মানুষের হুবহু সে একই দেহ হবে।

কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এ আয়াতটিও তার একটি। যদি ব্যাপারটি তা না হতো তাহলে কাফেরদের কথার জবাবে একথা বলা একেবারেই অর্থহীন হতো যে, মাটি তোমাদের দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা আছে এবং তার প্রতিটি অণু-পরমাণুর রেকর্ড আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস্‌ সাজদা, টীকা ২৫)

৫. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশটিতে একটি অতি বড় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ তারা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করা এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী ঠাওরানোকেই যথেষ্ট মনে করেনি। বরং যে সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন সে সময় তারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে নির্জলা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। অবশ্যম্ভাবীরূপে তার যে ফল হওয়ার ছিল এবং হয়েছে তা হচ্ছে, এ দাওয়াত এবং এ দাওয়াত পেশকারী রসূলের ব্যাপারে এরা কখনো স্থির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কখনো তাঁকে কবি বলে, কখনো বলে গণক কিংবা পাগল। কখনো বলে সে যাদুকর আবার কখনো বলে কেউ তাঁর ওপর যাদু করেছে। কখনো বলে নিজের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে এ বাণী নিজে বানিয়ে এনেছে আবার কখনো অপবাদ আরোপ করে যে, অন্যকিছু লোক তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারাই তাকে এসব কথা বানিয়ে দেয়। এসব পরস্পর বিরোধী কথাই প্রকাশ করে যে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কেই পুরোপুরি দ্বিধান্বিত। যদি তারা তাড়াহুড়া করে একেবারে প্রথমেই নবীকে অস্বীকার না করতো এবং কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করে আগেভাগেই একটি সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে ধীরস্থিরভাবে একথা ভেবে দেখতো যে, কে এ দাওয়াত পেশ করছে, কি কথা সে বলছে এবং তার দাওয়াতের স্বপক্ষে কি দলীল-প্রমাণ পেশ করছে তাহলে তারা কখনো এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তো না। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তাদের কাছে ঐ ব্যক্তি অপরিচিত কেউ ছিল না। সে অন্য কোনখান থেকে আকস্মিকভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। সে তাদের স্বজাতিরই একজন সদস্য ছিল। তাদের জানা শোনা লোক ছিল। তারা তাঁর চরিত্র ও কর্ম যোগ্যতা সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। এমন একজন মানুষের পক্ষ থেকে যখন একটি কথা পেশ করা হয়েছিল তখন সাথে সাথে তা গ্রহণ না করলেও শোনামাত্রই তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতও ছিল না। তাছাড়া সেটি যুক্তি-প্রমাণহীন কথাও ছিল না। সে তার পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করছিলো। তার প্রমাণাদি কতখানি যুক্তিসংগত তা খোলা কান দিয়ে শোনা এবং পক্ষপাতহীনভাবে যাঁচাই বাছাই করে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু এ নীতি গ্রহণ করার পরিবর্তে যখন তারা জিদের বশবর্তী হয়ে প্রথম পর্যায়েই তাকে অস্বীকার করে বসলো তখন তার ফল হলো এই যে, সত্য পর্যন্ত পৌঁছার একটি দরজা তারা নিজেরাই বন্ধ করে দিল এবং চারদিকে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ানোর অনেক দরজা খুলে নিল। এখন তারা নিজেদের প্রাথমিক ভুলকে যুক্তিসিদ্ধ করার পর পরস্পর বিরোধী আরো অনেক কথা গড়তে পারে। কিন্তু তিনি সত্য নবীও হতে পারেন এবং তার পেশকৃত কথা সত্যও হতে পারে এ একটি কথা চিন্তা করে দেখার জন্যও তারা প্রস্তুত নয়।

৬. উপরোল্লেখিত পাঁচটি আয়াতে মক্কার কাফেরদের ভূমিকার অযৌক্তিকতা স্পষ্ট করে দেয়ার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের যে খবর দিয়েছেন

তার সত্যতার প্রমাণাদি কি তা বলা হচ্ছে। এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, কাফেররা যে দু'টি বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিলো তার মধ্যে একটি অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে প্রারম্ভেই দু'টি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রথম প্রমাণটি হলো, তিনি তোমাদের সামনে কুরআন মজীদ পেশ করছেন যা তাঁর নবী হওয়ার খোলাখুলি প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিনি তোমাদের নিজেদের স্বজাতি ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোক। তিনি হঠাৎ আসমান থেকে কিংবা অন্য কোন অঞ্চল থেকে এসে হাজির হননি যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিনা আর এ কুরআন তাঁর নিজের রচিত কথা হতে পারে কিনা তা তাঁর জীবন, চরিত্র ও কর্ম যাঁচাই-বাছাই করে বিশ্লেষণ করা কঠিন। অতএব তাঁর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তোমাদের বিস্ময় অনর্থক। এ যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত দু'টি ইংগিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, মুহাম্মাদ (সা) যে সময় মক্কায় দাঁড়িয়ে নিজে সেসব লোকদের কুরআন শুনাচ্ছিলেন যারা তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাঁর গোটা জীবন দেখেছিল, সে সময়ের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে এসব ইংগিতের বিস্তারিত পরিবেশ ও পটভূমি আপনা থেকেই সুস্পষ্ট ছিল। তাই তাঁর বর্ণনা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঐ সব লোক অদ্ভুত ও বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী বলছে তার সত্যতার বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

৭. এখানে আসমান বলতে পূরো উর্ধজগতকে বুঝানো হয়েছে। যা মানুষ রাত-দিন তার মাথার ওপর ছেয়ে থাকতে দেখে। যেখানে দিনের বেলা সূর্য দীপ্তি ছড়ায়, রাতের বেলা চাঁদ এবং অসংখ্য তারকারাজি উজ্জল হয়ে দেখা দেয়। মানুষ যদি এগুলোকে খালি চোখেই দেখে তাহলেও সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ে। আর দূরবীন লাগিয়ে দেখলে এমন একটি বিশাল সুবিস্তৃত সৃষ্টিজগত তার সামনে ভেসে ওঠে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ হয়েছে বুঝা যাবে না। আমাদের পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় বিশালকায় গ্রহসমূহ এর মধ্যে বলের মত ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ অধিক উজ্জল তারকা তার মধ্যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমাদের এ সৌরজগত তার একটি মাত্র ছায়াপথের এক কোণে পড়ে আছে। এ একটি মাত্র ছায়াপথে আমাদের সূর্যের মত কমপক্ষে আরো ৩ শত কোটি তারকা (স্থির বস্তু) বিদ্যমান এবং মানুষের পর্যবেক্ষণ এ পর্যন্ত এরূপ দশ লাখ ছায়াপথের সন্ধান দিচ্ছে। এ লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছায়াপথটি এত দূরে অবস্থিত যে, তার আলো সেকেণ্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে অগ্রসর হয়ে দশ লাখ বছরে আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত পৌছে। এটা হচ্ছে সৃষ্টিজগতের সেই অংশের বিস্তৃতির অবস্থা যা এ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্ব কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তার কোন অনুমান আমরা করতে পারি না। হতে পারে, সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানি যতটুকু মানুষের জানা সৃষ্টিজগত গোটা সৃষ্টিজগতের অনুপাতের ততটুকুও নয়। যে আল্লাহ এ বিশাল সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন, ভূপৃষ্ঠের ধীরগতি ও বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষ নামে অভিহিত অতি ক্ষুদ্র জীব যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে যে, মৃত্যুর পর তিনি তাকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না তাহলে সেটা তার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতা মাত্র। তাতে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা কি করে সীমিত হতে পারে।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

এটা হচ্ছে বান্দাহদেরকে রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা। এ পানি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবন দান করি।[১০] (মৃত মানুষের মাটি থেকে) বেরিয়ে আসাও এভাবেই হবে।[১১]

এদের আগে নূহের কওম, আসহাবুর রাস,[১২] সামূদ, আদ, ফেরাউন,[১৩] লূতের ভাই, আইকাবাসী এবং তুব্বা কওমের[১৪] লোকেরাও অস্বীকার করেছিল।[১৫] প্রত্যেকেই রসূলদের অস্বীকার করেছিল[১৬] এবং পরিণামে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য কার্যকর হয়েছে।[১৭]

আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম? আসলে নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে এসব লোক সন্দেহে নিপতিত হয়ে আছে।[১৮]

৮. অর্থাৎ এ বিস্ময়কর বিস্তৃতি সত্ত্বেও এ বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা এমন সুশৃংখল ও মজবুত এবং তার বন্ধন এমন অটুট যে, তাতে কোথাও কোন চিড় বা ফাটল এবং কোথাও গিয়ে এর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয় না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝা যেতে পারে, আধুনিক যুগের বেতার সংকেত ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান–গবেষকগণ একটি ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করেছেন যাকে তারা উৎস ৩গ ২৯৫ (Source 3c 295) নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। উক্ত ছায়াপথ সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে, বর্তমানে আমাদের কাছে তার যে আলো এসে পৌছেছে তা চারশ' কোটি বছরেরও বেশী সময় পূর্বে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে থাকবে। এত দূর থেকে এসব আলোক রশ্মির পৃথিবী পর্যন্ত পৌছা কি করে সম্ভব হতো যদি পৃথিবী এবং উক্ত ছায়াপথের মাঝে বিশ্ব ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা কোথাও ছিন্ন থাকতো এবং বন্ধনে ফাটল থাকতো। আল্লাহ তা'আলা এ সত্যের দিকে ইংগিত করে প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে এ প্রশ্নই রেখেছেন যে, আমার সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানের এ ব্যবস্থাপনায় যখন তোমরা একটি সামান্য ছিদ্রও দেখিয়ে দিতে পারো না তখন তোমাদের মগজে আমার দুর্বলতার এ ধারণা কোথা থেকে আসে যে, তোমাদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিসেব–নিকেশ নেয়ার জন্য আমি তোমাদের জীবিত করে আমার সামনে হাজির করতে চাইলে তা করতে পারবো না।

এটা শুধু আখেরাতের সম্ভাবনার প্রমাণই নয় বরং তাওহীদেরও প্রমাণ। চারশত কোটি আলোক বর্ষের (Light Year) দূরত্ব থেকে এসব আলোক রশ্মির পৃথিবী পর্যন্ত পৌছা

এবং এখানে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়া খোলাখুলি একথা প্রমাণ করে যে, ঐ ছায়াপথ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিজগত একই বস্তুর তৈরী, তার মধ্যে একই রকম শক্তিসমূহ কর্মতৎপর রয়েছে এবং কোন প্রকার পার্থক্য ও ভিন্নতা ছাড়া তা একই রকম নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ করছে। তা না হলে এসব আলোক রশ্মি এ পৃথিবী পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হতো না এবং পৃথিবী ও তার পরিবেশে ক্রিয়াশীল নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষ যেসব যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে তাতেও ধরা পড়তো না। এতে প্রমাণিত হয়, একই আল্লাহ গোটা এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, মালিক, শাসক ও ব্যবস্থাপক।

৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহ্‌ল, টীকা ১২, ১৩ ও ১৪; আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩ ৭৪; আয্ যুখরুফ, টীকা ৭।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩, ৭৪, ৮১; আর রূম, টীকা ২৫, ৩৩, ৩৫; ইয়াসীন, টীকা ২৯।

১১. যুক্তি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ পৃথিবী-গ্রহটিকে জীবন্ত সৃষ্টির বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান বানিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর প্রাণহীন মাটিকে আসমানের প্রাণহীণ পানির সাথে মিশিয়ে এত উচ্চ পর্যায়ের উদ্ভিদ জীবন সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত রূপে শ্যামলিমায় ভরে উঠতে দেখছো এবং যিনি এ উদ্ভিদরাজিকে মানুষ ও জীব-জন্তু সবার জন্য রিযিকের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা যে, মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। এটা নিরেট নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা নিজের চোখে অহরহ দেখছো, একটি এলাকা একেবারে শুষ্ক ও প্রাণহীণ পড়ে আছে, বৃষ্টির একটি বিন্দু পড়া মাত্রই তার ভেতর থেকে অকস্মাত জীবনের ঝর্ণাধারা ফুটে বের হয়, যুগ যুগ ধরে মৃত শিকড়সমূহ হঠাৎ জীবন ফিরে পায় এবং মাটির গভীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে নানা রকম কীট ও পোকামাকড় বেরিয়ে এসে নর্তন কুর্দন শুরু করে দেয়। মৃত্যুর পরে জীবন যে আবার অসম্ভব নয় এটা তারই স্পষ্ট প্রমাণ। তোমাদের এ স্পষ্ট পর্যবেক্ষণকে যখন তোমরা মিথ্যা বলতে পার না তখন একথা কি করে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চাও যে, আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন তখন তোমরা নিজেরাও ঠিক তেমনি মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে যেমনভাবে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরব ভূখণ্ডের বহু অঞ্চল এমন যেখানে কোন কোন সময় পাঁচ বছর পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। এমনকি কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী সময় চলে যায় কিন্তু আসমান থেকে একবিন্দু বৃষ্টিও ঝরে না। উত্তপ্ত মরুভূমিতে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘাসের মূল এবং কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের জীবিত থাকা কল্পনাতীত। তা সত্ত্বেও কোন সময় যখন সেখানে সামান্য বৃষ্টিও হয় তখন ঘাস ফুটে বের হয় এবং কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় জীবনলাভ করে। সুতরাং এত দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির অভিজ্ঞতা যাদের নেই তাদের তুলনায় আরবের লোকেরা আরো ভালভাবে এ যুক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম।

১২. এর আগে সূরা ফুরকানের ৩৮ আয়াতে 'আসহাবুর রাস্‌সের' আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় বারের মত তাদের উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে উভয় স্থানেই নবীদের

অস্বীকারকারী জাতিসমূহের সাথে কেবল মাত্র তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কোন বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। আরবের কিংবদন্তীতে আর রাস্ নামে দু'টি স্থান সুপরিচিত। একটি নাজদে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর হিজাযে। এর মধ্যে নাজদের আর রাস অধিক পরিচিত এবং জাহেলী যুগের কাব্য গাঁথায় এর উল্লেখই বেশী পাওয়া যায়। আসহাবুর রাস্ এ দু'টি স্থানের কোন্‌টির অধিবাসী ছিল তা এখন নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কোন বর্ণনাতেই তাদের কাহিনীর নির্ভরযোগ্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। বড় জোর এতটুকু সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যে, তারা ছিল এমন এক জাতি যারা তাদের নবীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তবে তাদের বিষয়ে কুরআন মজীদে শুধু ইংগিত দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, কুরআন নাযিলের সময় আরবরা ব্যাপকভাবে তাদের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এসব বর্ণনা ও কাহিনী ইতিহাসে সংরক্ষিত হতে পারেনি।

১৩. "ফেরাউনের কওম" বলার পরিবর্তে শুধু ফেরাউনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সে তার জাতির ঘাড়ে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, তার সামনে তার জাতির কোন স্বাধীন বক্তব্য ও দৃঢ়তা অবশিষ্ট ছিল না। সে যে গোমরাহীর দিকেই অগ্রসর হতো তার জাতিও তার পেছনে পেছনে ছুটে চলতো। তাই একা ঐ ব্যক্তিকে গোটা জাতির গোমরাহীর জন্য দায়ী করা হয়েছে। যেখানে জাতির মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা আছে সেখানে তার কাজ–কর্মের দায়–দায়িত্ব সে জাতি নিজেই বহন করে। আর যেখানে এক ব্যক্তির একনায়কত্ব জাতিকে অসহায় করে রাখে সেখানে সেই এক ব্যক্তিই গোটা জাতির অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এ বোঝা এক ব্যক্তির ঘাড়ে উত্তোলিত হওয়ার পর জাতি তার দায়–দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি পেয়ে যায়। না, সে ক্ষেত্রে নিজের ঘাড়ে এক ব্যক্তিকে এভাবে চেপে বসতে দিয়েছে কেন, সেই নৈতিক দুর্বলতার দায়িত্ব জাতির ওপর অবশ্যই বর্তায়। সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

"ফেরাউন তার জাতিকে গুরুত্বহীন মনে করে নিয়েছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক।"

(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুখরুফের ব্যাখ্যা, টীকা ৫)

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৩৭; সূরা দুখান, টীকা ৩২।

১৫. অর্থাৎ তারা সবাই তাদের রসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে এবং মৃত্যুর পরে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে তাঁদের দেয়া এ খবরও অস্বীকার করেছে।

১৬. যদিও প্রত্যেক জাতি কেবল তাদের কাছে প্রেরিত রসূলকেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা যেহেতু এমন একটি খবরকে অস্বীকার করছিল যা সমস্ত রসূল সর্বসম্মতভাবে

পেশ করছিলেন। তাই একজন রসূলকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রসূলকেই অস্বীকার করার নামান্তর। তাছাড়া এসব জাতির প্রত্যেকে কেবল তাদের কাছে আগমনকারী রসূলের রিসালাত অস্বীকার করেনি, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের হিদায়াতের জন্য কোন মানুষ যে আদিষ্ট হয়ে আসতে পারে একথা মানতে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা ছিল মূলত রিসালাতেরই অস্বীকারকারী এবং তাদের কারো অপরাধই শুধুমাত্র একজন রসূলের অস্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

১৭. এটা আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন। এর পূর্বের ৬টি আয়াতে আখেরাতের সম্ভাবনার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে পেশ করা হয়েছে আখেরাতের বাস্তবতার প্রমাণ। সমস্ত নবী–রসূল আলাইহিমুস সালাম আখেরাত সম্পর্কিত যে আকীদা পেশ করেছেন তা যে সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব তার প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতে আরব ও তার আশেপাশের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক পরিণতিকে পেশ করা হয়েছে। কারণ যে জাতিই তা অস্বীকার করেছে সে জাতিই চরম নৈতিক বিকৃতির শিকার হয়েছে। এমনকি পরিশেষে আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে পৃথিবী থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অখেরাতের অস্বীকৃতির সাথে নৈতিক বিকৃতির এ অনিবার্যতা যা ইতিহাসের আবর্তনের সাথে সাথে একের পর এক পরিলক্ষিত হয়—একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এ দুনিয়ায় মানুষকে প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বহীন ও কৃতকর্মের জবাবদিহি মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তাকে তার সমস্ত কাজ–কর্মের জবাব দিতে হবে। এ কারণে যখনই সে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে দুনিয়ায় কাজ করে তখনই তার গোটা জীবন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। যখন কোন কাজের ক্রমাগতভাবে খারাপ ফলাফল দেখা দিতে থাকে তখন তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কাজটি বাস্তবতার পরিপন্থী।

১৮. এটা আখেরাতের সপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে না এবং সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত এ বিশ্ব–জাহানে মানুষের সৃষ্টিকে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করার মত নির্বুদ্ধিতা যাকে পেয়ে বসেনি তার পক্ষে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এবং পুরো এ বিশ্ব–জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যে এ দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় বর্তমান এবং দুনিয়া ও আসমানের এসব কাজ–কারবার যে আমাদের চোখের সামনেই চলছে, এটা স্বতই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে এবং এ বিশ্ব–জাহানকে সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি বলে যে, কিয়ামত সংঘটিত করার পর সেই আল্লাহই আরেকটি জগত সৃষ্টি করতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় আমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না তাহলে সে একটি যুক্তি বিরোধী কথাই বলে। আল্লাহ অক্ষম হলে প্রথমবারই তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম থাকতেন। তিনি যখন প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্মের বদৌলতেই আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি তখন নিজের সৃষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অপারগ হবেন কেন? এর কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে?

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاۤءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

আমি[১৯] মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও তার বেশী কাছে আছি।[২০] (আমার এ সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাঁ দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।[২১] তারপর দেখো, মৃত্যুর যন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে হাজির হয়েছে।[২২] এটা সে জিনিস যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে।[২৩] এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হলো।[২৪] এটা সেদিন যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো।

১৯. আখেরাতের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পর বলা হচ্ছে, তোমরা আখেরাতকে মেনে নাও বা অস্বীকার করো সর্বাবস্থায় তা অবধারিত এবং তা এমন একটি বাস্তব ঘটনা যা তোমাদের অস্বীকার করা সত্ত্বেও সংঘটিত হবে। নবী-রসূলদের অগ্রিম সতর্ক বাণী বিশ্বাস করে সেই সময়ের জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে এবং বিশ্বাস না করলে নিজেরাই নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। না মানলে আখেরাতের আগমন থেমে থাকবে না এবং আল্লাহর ন্যায়ের বিধান অচল হয়ে যাবে না।

২০. অর্থাৎ আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান ভিতর ও বাহির থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টিত করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার যতটা নিকটে ততটা নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয়। তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় পাকড়াও করতে হয় তখনও আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্বাধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে বন্দী করবো।

২১. অর্থাৎ এক দিকে আমি নিজে সরাসরি মানুষের প্রতিটি গতিবিধি এবং চিন্তা ও কল্পনা সম্পর্কে অবহিত। অপর দিকে প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে যারা তার প্রত্যেকটি তৎপরতা লিপিবদ্ধ করছে। তার কোন কাজ ও কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। অর্থাৎ আল্লাহর আদালতে যে সময় মানুষকে পেশ করা হবে তখন কে কি করে এসেছে সে বিষয়ে আল্লাহ নিজ থেকেই অবহিত থাকবেন। তাছাড়া সে বিষয়ে সাক্ষ দেয়ার জন্য এমন দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন যারা তার কাজ–কর্মের লিখিত নথিভুক্ত প্রমাণাদি এনে সামনে পেশ করবেন। লিখিত এ প্রমাণাদি কেমন ধরনের হবে তার সঠিক ধারণা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আজ আমাদের সামনে যেসব সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তা দেখে এ বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে, যে পরিবেশে মানুষ অবস্থান ও কাজ–কর্ম করে তাতে চতুর্দিকের প্রতিটি অণু–পরমাণুর ওপর তার কন্ঠস্বর, ছবি ও গতিবিধির ছাপ পড়ে যাচ্ছে। এসব জিনিসের প্রত্যেকটিকে পুনরায় হুবহু সেই আকার–আকৃতি ও স্বরে এমনভাবে পেশ করা যেতে পারে যে, আসল ও নকলের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও থাকবে না। মানুষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কাজটি অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় করছে। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতারা এসব যন্ত্রপাতিরও মুখাপেক্ষী নয়, এসব প্রতিবন্ধকতায়ও আবদ্ধ নয়। মানুষের নিজ দেহ এবং তার চারপাশের প্রতিটি জিনিস তাদের জন্য টেপ ও ফিল্ম স্বরূপ। তারা এসব টেপ ও ফিল্মের ওপর প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি ছবি অতি সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয়সহ অবিকল ধারণ করতে পারে এবং পৃথিবীতে ব্যক্তি যেসব কাজ করতো কিয়ামতের দিন তাকে তার নিজ কানে নিজ কন্ঠস্বরে সেসব কথা শুনিয়ে দিতে পারে, নিজ চোখে তার সকল কর্মকাণ্ডের এমন জ্বলজ্যান্ত ছবি তাকে দেখিয়ে দিতে পারে যা অস্বীকার করা তার জন্য সম্ভব হবে না।

এখানে একথাটিও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের আদালতে কোন ব্যক্তিকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করবেন না, বরং ন্যায় বিচারের সমস্ত পূর্বশর্ত পূরণ করে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কারণে দুনিয়াতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের পূর্ণাংগ রেকর্ড তৈরী করা হচ্ছে যাতে অনস্বীকার্য সাক্ষের ভিত্তিতে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রমাণাদি পেশ করা যায়।

২২. পরম সত্য নিয়ে হাজির হওয়ার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা সেই পরম সূচনা বিন্দু যেখান থেকে দুনিয়ার জীবনে পর্দার আড়ালে লুকানো মহাসত্য উন্মুক্ত হতে আরম্ভ করে। এ সময় মানুষ সেই জগতটিকে স্পষ্ট দেখতে পায় যার খবর নবী–রসূলগণ দিয়েছিলেন। তখন সে একথাও জানতে পারে যে, আখেরাত পুরোপুরি সত্য। জীবনের এ দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সৌভাগ্যবান হিসেবে প্রবেশ করছে, না হতভাগ্য হিসেবে, সে সত্যও সে জানতে পারে।

২৩. অর্থাৎ এটা সেই চরম সত্য যা মানতে তুমি টালবাহানা করছিলে। তুমি পৃথিবীতে বন্ধনমুক্ত বলদের মত অবাধে বিচরণ করতে চাচ্ছিলে, আরো চাচ্ছিলে মৃত্যুর পরে যেন আর কোন জীবন না থাকে যেখানে তোমাকে নিজের সমস্ত কাজ–কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ কারণে তুমি আখেরাতের ধ্যান–ধারণা থেকে দূরে অবস্থান করতে এবং কোন সময় এ জগত বাস্তব রূপ লাভ করবে তা কোনক্রমেই মানতে প্রস্তুত ছিলে না। এখন দেখো, সেই আরেকটি জগতই তোমার সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে।

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ
مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ
قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾
مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَأَلْقِيٰهُ
فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ
فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ
بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অবস্থায় এসে হাজির হলো যে, তাদের সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার মত একজন এবং সাক্ষ দেয়ার মত একজন ছিল।[২৫] এ ব্যাপারে তুমি অজ্ঞ ছিলে। তাই তোমার সামনে যে আবরণ ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।[২৬] তার সাথী বললো ঃ এতো সে হাজির আমার ওপরে যার তদারকীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।[২৭] নির্দেশ দেয়া হলো ঃ "জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,[২৮] প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে[২৯]—যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, কল্যাণের প্রতিবন্ধক[৩০] ও সীমালংঘনকারী ছিল,[৩১] সন্দেহ সংশয়ে নিপতিত ছিল[৩২] এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে বসেছিল। নিক্ষেপ কর তাকে কঠিন আযাবে।[৩৩] তার সহগামী আরয করলো ঃ হে প্রভু, আমি তাকে বিদ্রোহী করিনি বরং সে নিজেই চরম গোমরাহীতে ডুবে ছিল।[৩৪] জবাবে বলা হলো ঃ আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি আগেই তোমাদেরকে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলাম।[৩৫] আমার কথার কোন রদবদল হয় না।[৩৬] আর আমি আমার বান্দাদের জন্য অত্যাচারী নই।[৩৭]

২৪. এর অর্থ শিংগার ফুৎকার। এ ফুৎকারের সাথে সাথে সমস্ত মৃত লোক দৈহিক জীবন পেয়ে পুনরায় উঠে দাঁড়াবে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; ত্বাহা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১; ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭; আয্ যুমার, টীকা ৭৯।

২৫. সম্ভবত এর দ্বারা সেই দু'জন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যারা পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের রেকর্ড প্রস্তুত করতে নিযুক্ত ছিল। কিয়ামতের দিন সিংগায়

ফুৎকারের আওয়াজ উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ যখন তার কবর থেকে উঠবে তৎক্ষণাৎ উক্ত দু' ফেরেশতা এসে তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেবে। একজন তাকে আল্লাহ তায়ালার আদালতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে এবং অন্যজন তার 'আমলনামা' সাথে নিয়ে যাবে।

২৬. অর্থাৎ এখন তুমি খুব ভাল করেই দেখতে পাচ্ছ যে, আল্লাহর নবী তোমাকে যে খবর দিতেন তার সব কিছুই আজকে এখানে বিদ্যমান।

২৭. মুফাস্সিরদের কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, সাথী অর্থ ২১ আয়াতে বর্ণিত সাক্ষদাতা ফেরেশতা। সে বলবে ঃ এইতো এ ব্যক্তির 'আমলনামা' আমার কাছে প্রস্তুত আছে। অপর কিছু সংখ্যক মুফাস্সির বলেন ঃ যে শয়তান পৃথিবীতে তার সাথে অণুক্ষণ লেগেছিল সাথী অর্থ সেই শয়তান। সে বলবে, এ ব্যক্তি সে-ই যাকে আমি আমার কব্জায় রেখে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি এখন সে আপনার সামনে হাজির। তবে কাতাদা ও ইবনে যায়েদ থেকে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাই এর পূর্বাপর প্রসংগের সাথে সংগতিপূর্ণ। তারা বলেন, সাথী বলতে বুঝানো হয়েছে সে ফেরেশতাকে যে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে এবং সে নিজেই আল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে আরয করবে, এ ব্যক্তি আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। এখন সে মহান প্রভুর দরবারে হাজির।

২৮. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হচ্ছে اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ "তোমরা দু'জন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।" বক্তব্যের ধারাবাহিকতাই বলে দিচ্ছে যে, কবর থেকে উঠতেই অপরাধীকে যে দু'জন ফেরেশতা গ্রেফতার করেছিলো এবং আদালতে হাজির করেছিলো তাদের লক্ষ করে এ নির্দেশ দেয়া হবে।

২৯. মূল আয়াতে كَفَّار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে চরম অকৃতজ্ঞ। অপরটি হচ্ছে চরম সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

৩০.আরবী ভাষায় خَيْر শব্দটি সম্পদ অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কল্যাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ থেকে বান্দা ও আল্লাহ কারো হকই আদায় করতো না। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা কল্যাণের পথ থেকে নিজেরাই যে কেবল বিরত থাকতো তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখতো। তারা পৃথিবীর কল্যাণের পথে বাধা হয়েছিলো। কোনভাবেই যেন কল্যাণ ও সুকৃতি বিস্তার লাভ করতে না পারে এ উদ্দেশ্যেই তারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছিলো।

৩১. অর্থাৎ নিজের প্রতিটি কাজে নৈতিকতার সীমালংঘনকারী। নিজের স্বার্থ, উদ্দেশ্যাবলী ও আশা-আকাংখ্যার জন্য যে কোন কাজ করতে সে প্রস্তুত থাকতো। হারাম পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতো এবং হারাম পথেই তা ব্যয় করতো। মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো। না তার মুখ কোন বাধ্য-বাধকতায় সীমাবদ্ধ ছিল, না তার হাত কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকতো। কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই সে যথেষ্ট মনে করতো না, বরং আরো অগ্রসর হয়ে সততা ও কল্যাণের পথের অনুসারীদেরকে সে উত্যক্ত করতো এবং কল্যাণের জন্য যারা কাজ করতো তাদের ওপর নির্যাতন চালাতো।

৩২. মূল আয়াতে مريب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, সন্দেহপোষণকারী। দুই, সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপকারী। এখানে দু'টি অর্থই গ্রহণীয়। অর্থাৎ নিজেও সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিলো এবং অন্যদের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি করতো। তার কাছে আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, অহী এক কথায় ইসলামের সব সত্যই ছিল সন্দেহজনক। নবী-রসূলদের পক্ষ থেকে ন্যায় ও সত্যের যে কথাই পেশ করা হতো তার ধারণায় তা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাই সে আল্লাহর অন্য বান্দাদের মধ্যেও এ রোগ ছড়িয়ে বেড়াতো। সে যার সাথেই মেলামেশার সুযোগ পেতো তার অন্তরেই কোন না কোন সন্দেহ এবং কোন না কোন দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি করে দিতো।

৩৩. যেসব বিষয় মানুষকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানায় এ আয়াত ক'টিতে আল্লাহ তা'আলা সেগুলো নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন ঃ (১) সত্যকে অস্বীকার, (২) আল্লাহর প্রতি অকৃজ্ঞতা, (৩) সত্য ও সত্যপন্থীদের সাথে শত্রুতা, (৪) কল্যাণের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ানো, (৫) নিজের অর্থ-সম্পদ দ্বারা আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় না করা, (৬) নিজের আচার আচরণে সীমালংঘন করা, (৭) মানুষের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করা, (৮) ইসলামের বিধানসমূহের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা, (৯) অন্যদের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা এবং (১০) প্রভুত্বে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।

৩৪. এখানে বক্তব্যের ধরন থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে, 'সাথী' অর্থ শয়তান—যে পৃথিবীতে তার পেছনে লেগেছিলো। বক্তব্যের ধরন থেকে একথারও ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঐ ব্যক্তি ও তার শয়তান উভয়ে আল্লাহর আদালতে পরস্পর ঝগড়া করছে। সে বলছে, জনাব, এ জালেম আমার পেছনে লেগেছিলো এবং শেষপর্যন্ত সে-ই আমাকে পথভ্রষ্ট করে ক্ষান্ত হয়েছে। সুতরাং শাস্তি পাওয়া উচিত তার। শয়তান তার জবাবে বলছে ঃ জনাব, আমার তো তার ওপরে কোন হাত ছিল না যে, সে বিদ্রাহী হতে না চাইলেও আমি জোর করে তাকে বিদ্রাহী বানিয়ে দিয়েছি। এ দুর্ভাগার তো নিজেরই সৎকাজের প্রতি ঘৃণা এবং মন্দকাজের প্রতি আসক্তি ছিলো। তাই নবী-রসূলদের কোন কথাই তার মনোপূত হয়নি এবং আমার প্ররোচনায় সে ক্রমাগত বিপথগামী হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের দু'জনকেই আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে যে অন্যকে বিভ্রান্ত করবে সে কি শাস্তি পাবে এবং যে বিভ্রান্ত হবে তাকে কি পরিণাম ভোগ করতে হবে। আমার এ সতর্কবাণী সত্ত্বেও তোমরা উভয়েই যখন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হওনি তখন এ মুহূর্তে ঝগড়া করে কি লাভ। এখন বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী উভয়কে বিভ্রান্ত হওয়া ও বিভ্রান্ত করার শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

৩৬. অর্থাৎ আমার কাছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন নিয়ম নেই। তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের যে নির্দেশ আমি দিয়েছি তা এখন প্রত্যাহার করা যেতে পারে না। তা ছাড়া বিপথগামী করার ও বিপথগামী হওয়ার শাস্তি আখেরাতে কি হবে সে বিষয়ে আমি পৃথিবীতে যে নিয়মের ঘোষণা দিয়েছিলাম তাও আর এখন পরিবর্তন করা যেতে পারে না।

৩৭. মূল আয়াতে ظلام শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ চরম অত্যাচারী। একথার অর্থ এ নয় যে, আমি আমার বান্দার ব্যাপারে চরম অত্যাচারী নই বরং অত্যাচারী। এর অর্থ বরং এই যে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হয়ে যদি আমি আমার প্রতিপালিত সৃষ্টির ওপরে

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

৩ রুকূ'

সেদিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো যে, তোমার পেট কি ভরেছে? সে বলবে, "আরো কিছু আছে না কি?"[৩৮] আর বেহেশতকে আল্লাহভীরুদের নিকটতর করা হবে—তা মোটেই দূরে থাকবে না।[৩৯] তখন বলা হবে ঃ এ হচ্ছে সেই জিনিস, যার কথা তোমাদেরকে আগাম জানানো হতো। এটা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী[৪০] ও সংরক্ষণকারীর[৪১] জন্য, যে অদেখা দয়াময়কে ভয় করতো,[৪২] যে অনুরক্ত হৃদয় নিয়ে এসেছে।[৪৩] বেহেশতে ঢুকে পড় শান্তির সাথে।[৪৪] সেদিন অনন্ত জীবনের দিন হবে। সেখানে তাদের জন্য যা চাইবে তাই থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।[৪৫]

জুলুম করি সে ক্ষেত্রে আমি হবো চরম জালেম। তাই আমি আমার বান্দার ওপরে আদৌ কোন জুলুম করি না। যে শাস্তি তোমাকে আমি দিচ্ছি তা ঠিক ততখানি যার উপযুক্ত তুমি নিজেই নিজেকে বানিয়েছো। তোমার প্রাপ্য শাস্তির চাইতে সামান্য অধিক শাস্তিও তোমাকে দেয়া হচ্ছে না। আমার আদালত নির্ভেজাল ও পক্ষপাতহীন ইনসাফের আদালত। কোন ব্যক্তি এখানে এমন কোন শাস্তি পেতে পারে না আসলেই সে যার উপযুক্ত নয় এবং নিশ্চিত সাক্ষ দ্বারা যা প্রমাণ করা হয়নি।

৩৮. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এখন আমার মধ্যে আর অধিক মানুষের স্থান সংকুলানের অবকাশ নেই। অপরটি হচ্ছে আরো যত অপরাধী আছে তাদের নিয়ে আসুন। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে একথা থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তাহলো অপরাধীদেরকে এমন গাদাগাদি করে জাহান্নামে ভরা হয়েছে যে, সেখানে একটি সুঁচ পরিমাণ স্থানও আর অবশিষ্ট নেই। তাই জাহান্নামকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তোমার উদর কি পূর্ণ হয়েছে? তখন সে বিব্রত হয়ে জবাব দিচ্ছে এখনো কি আরো মানুষ আছে? দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে মনে এরূপ একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সে সময় জাহান্নাম অপরাধীদের প্রতি এমন ভীষণভাবে রুষ্ট থাকবে যে, সে 'আরো কেউ আছে কি' বলে চাইতে থাকবে এবং সেদিন যেন কোন অপরাধী রেহাই না পায় তাই কামনা করবে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্ন এবং জাহান্নামের এ জবাবের ধরন কি হবে? এটা কি শুধু রূপক বর্ণনা? না কি বাস্তবে জাহান্নাম প্রাণ সত্তাধারী বাকশক্তিসম্পন্ন কোন বস্তু যাকে সম্বোধন করা যেতে পারে এবং সে–ও কথার জবাব দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে কোন কিছু বলা যেতে পারে না। হতে পারে এটা একটা রূপক কথা। পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রশ্নোত্তর আকারে জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোন লোক যদি বলে, আমি গাড়ীকে বললাম তুমি চলছো না কেন? সে জবাব দিল; আমার মধ্যে পেট্রোল নেই। তবে এটাও পুরোপুরি সম্ভব যে, কথাটি বাস্তব ভিত্তিকই হবে। কারণ, পৃথিবীর যেসব জিনিস আমাদের কাছে অচেতন জড় পদার্থ এবং বাকশক্তিহীন সেসব জিনিস সম্পর্কে আমাদের এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয় যে, তা আল্লাহর কাছেও অবশ্যই তদ্রূপ অচেতন জড় ও বাকশক্তিহীন পদার্থ হবে। স্রষ্টা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারেন এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর কথার জবাবও দিতে পারে। তার ভাষা আমাদের কাছে যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন?

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদালতে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যেই মাত্র ফায়সালা হবে যে, সে মুত্তাকী এবং জান্নাতলাভের উপযুক্ত, তৎক্ষণাত সে তার সামনে জান্নাতকে বিদ্যমান পাবে। জান্নাত পর্যন্ত পৌছার জন্য তাকে কোন দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না যে, তাকে পায়ে হেঁটে কিংবা কোন বাহনে বসে ভ্রমণ করে সেখানে পৌছতে হবে তাই ফায়সালার সময় ও জান্নাতে প্রবেশের সময়ের মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকবে। বরং একদিকে ফায়সালা হবে অন্যদিকে সে তখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেন তাকে জান্নাতে পৌছানো হয়নি, জান্নাতকেই উঠিয়ে তার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, আখেরাতের স্থান ও কালের ধারণা আমাদের এ পৃথিবীর স্থান ও কালের ধারণা থেকে কতটা ভিন্ন হবে। দ্রুততা ও বিলম্ব এবং দূর ও নিকট সম্পর্কে এ পৃথিবীতে আমাদের যে জ্ঞান আছে সেখানে তা সবই অর্থহীন হবে।

৪০. মূল আয়াতে أَوَّابٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা অনেক ব্যাপক অর্থবহ। এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে নাফরমানী এবং প্রবৃত্তির আকাংখা চরিতার্থ করার পথ পরিহার করে আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ অবলম্বন করেছে, যে আল্লাহর পছন্দ নয় এমন প্রতিটি জিনিস পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করে তা গ্রহণ করে, বন্দেগীর পথ থেকে পা সামান্য বিচ্যুত হলেই যে বিচলিত বোধ করে এবং তাওবা করে বন্দেগীর পথে ফিরে আসে, যে অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের সমস্ত ব্যাপারে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়।

৪১. মূল আয়াতে حَفِيظٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ "রক্ষাকারী"। এর দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তার দায়িত্বে ন্যস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপিত অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে, যে ঈমান এনে তার রবের সাথে যে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তা রক্ষা করে, যে তার শক্তি, শ্রম ও চেষ্টা–সাধনার পাহারাদারি করে যাতে এসবের কোনটি ভ্রান্ত কাজে নষ্ট না হয়, যে তাওবা করে তা রক্ষা

করে এবং তা ভঙ্গ হতে দেয় না, যে সর্বাবস্থায় আত্মসমালোচনা করে দেখতে থাকে যে, সে তার কথায় ও কাজে কোথাও তার রবের নাফরমানী তো করছে না?

৪২. অর্থাৎ সে কোথাও রহমান বা পরম দয়ালু আল্লাহর দেখা পেতো না এবং নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও কোনভাবেই তাঁকে অনুভব করতে পারতো না। তা সত্ত্বেও তাঁর নাফরমানী করতে সে ভয় পেতো। অন্যান্য অনুভূত শক্তি এবং প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয় এমন সব শক্তি ও সত্তার তুলনায় তার মনে অদেখা রহমানের ভয় অধিক প্রবল ছিল। তিনি 'রহমান' বা দয়ালু একথা জানা সত্ত্বেও তাঁর রহমতের ভরসায় সে গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি, বরং সবসময়ই তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় পেয়েছে। এভাবে আয়াতটি ঈমানদার ব্যক্তির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গুণের প্রতি ইংগিত করে। একটি হচ্ছে, অনুভূত ও দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহকে ভয় করে। অপরটি হচ্ছে, সে আল্লাহর রহমত গুণটি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও গোনাহ করার দুঃসাহস করে না। এ দু'টি গুণই তাকে আল্লাহর কাছে মর্যাদার অধিকারী করে তোলে। তাছাড়াও এ আয়াতের মধ্যে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে যা ইমাম রাযী বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে, আরবী ভাষায় ভয় বুঝাতে خوف ও خشيت এ দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ দু'টি শব্দের অর্থে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। خوف শব্দটি সাধারণত এমন ভয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা কারো শক্তির সামনে নিজের দুর্বলতার অনুভূতির কারণে নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয়। আর خشيت বলা হয় এমন ভীষণ ভয়কে যা কারো বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়। এখানে خوف এর পরিবর্তে خشيت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, শুধু শাস্তির আশংকায়ই মু'মিন বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় না। তার চেয়েও বড় জিনিস অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি সবসময় তার মনে এক ভয়ানক ভীতিভাব জাগিয়ে রাখে।

৪৩. মূল কথাটি হচ্ছে قلب منيب নিয়ে এসেছে। منيب শব্দটির উৎপত্তি انابت থেকে যার অর্থ একদিকে মুখ করা এবং বারবার সেদিকেই ফিরে যাওয়া। যেমন কম্পাসের কাঁটা সবসময় মেরুর দিকেই মুখ করে থাকে। আপনি তাকে যতই নাড়া চাড়া বা ঝাঁকুনি দেন না কেন তা ঘুরে ফিরে মেরুর দিকে চলে আসে। অতএব قلب منيب অর্থ এমন হৃদয়-মন যা সব দিক থেকে এক আল্লাহর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অতপর সারা জীবন তার ওপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাতে সে বার বার তাঁর দিকেই ফিরে এসেছে। এ বিষয়টাকেই আমরা "অনুরক্ত মন" কথাটি দিয়ে ব্যক্ত করেছি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কাছে প্রকৃত সম্মানের অধিকারী সে ব্যক্তি যে শুধু মুখে নয় বরং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে সরল মনে তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে যায়।

৪৪. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ। سَلَامٌ শব্দটিকে যদি নিরাপত্তা অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, সব রকম দুঃখ, দুশ্চিন্তা, চিন্তা ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে এ জান্নাতে প্রবেশ করো। তবে যদি শান্তি অর্থেই গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ হবে, এ জান্নাতে এসো, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম।

যে গুণাবলী থাকলে কোন ব্যক্তি জান্নাতলাভের উপযুক্ত হয় এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। ঐগুলো হচ্ছে ঃ (১) তাকওয়া, (২) আল্লাহর

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ۗ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾

আমি তাদের আগে আরো বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি। তারা ওদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর ছিল এবং তারা সারা দুনিয়ার দেশগুলো তন্ন তন্ন করে ঘুরেছে।[৪৬] অথচ তারা কি কোন আশ্রয়স্থল পেলো?[৪৭] যাদের হৃদয় আছে কিংবা যারা একাগ্র চিত্তে কথা শোনে[৪৮] তাদের জন্য এ ইতিহাসে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি।[৪৯] অথচ তাতে আমি ক্লান্ত হইনি। কাজেই তারা যেসব কথা তৈরী করছে তার ওপর ধৈর্যধারণ করো।[৫০] আর স্বীয় প্রভুর প্রশংসা সহকারে গুণগান করতে থাকো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে, আবার রাতে পুনরায় তার গুণগান করো এবং সিজ্‌দা দেয়ার পরেও করো।[৫১]

দিকে প্রত্যাবর্তন, (৩) আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্কের সযত্ন পাহারাদারী, (৪) আল্লাহকে না দেখে এবং তাঁর ক্ষমা পরায়ণতায় বিশ্বাসী হয়েও তাঁকে ভয় করা এবং (৫) অনুরক্ত হৃদয়–মন নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছা অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত অনুরক্ত থাকার আচরণ করে যাওয়া।

৪৫. অর্থাৎ তারা যা চাইবে তাতো পাবেই। কিন্তু আমি তাদেরকে আরো এমন কিছু দেব যা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করা তো দূরের কথা তাদের মন–মগজে তার কল্পনা পর্যন্ত উদিত হয়নি।

৪৬. অর্থাৎ তারা শুধু নিজেদের দেশেই শক্তিমান ছিল না পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও প্রবেশ করে দখল জমিয়েছিলো এবং ভূপৃষ্ঠের দূর–দূরান্ত পর্যন্ত তাদের লুট–তরাজের অপকর্ম বিস্তার লাভ করেছিলো।

৪৭. অর্থাৎ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে পাকড়াও করার সময় সমুপস্থিত হলো তখন কি তাদের শক্তি তাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো? পৃথিবীতে কোথাও

কি তারা আশ্রয় লাভ করেছিলো? তাহলে কোন্ ভরসায় তোমরা এ আশা পোষণ করো যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তোমরা কোথাও আশ্রয় পেয়ে যাবে?

৪৮. অন্য কথায় যাদের নিজেদের অন্তত এতটুকু বিবেক–বুদ্ধি আছে যে সঠিক চিন্তা করতে পারে কিংবা উদাসীনতা ও পক্ষপাত থেকে এতটা পবিত্র ও মুক্ত যে, যখন অন্য কেউ তাকে প্রকৃত সত্য বুঝায় তখন একাগ্রভাবে তার কথা শোনো। এমনভাবে নয় যে, শ্রোতার মন–মগজ অন্য দিকে ব্যস্ত থাকায় উপদেশদাতার কথা কানের পর্দার ওপর দিয়েই চলে যায়।

৪৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা–মীম আস সাজদার তাফসীর, টীকা ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত।

৫০. অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমি গোটা এ বিশ্ব–জাহান মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং তা সৃষ্টি করে আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়িনি যে, পুনরায় তা সৃষ্টি করার সাধ্য আর আমার নেই। এখন এসব নির্বোধরা যদি তোমার কাছে মৃত্যুর পরের জীবনের খবর শুনে তোমাকে বিদ্রূপ করে এবং পাগল বলে আখ্যায়িত করে তাহলে ধৈর্য অবলম্বন করো। ঠাণ্ডা মাথায় এদের প্রতিটি অর্থহীন কথা শোন এবং তোমাকে যে সত্যটি পেশ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে তা পেশ করতে থাকো।

এ আয়াতে আনুষঙ্গিকভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপও প্রচ্ছন্ন আছে। কারণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাইবেলে এ কল্পকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন (আদিপুস্তক, ২:২)। বর্তমানে যদিও খৃষ্টান পাদরীরা এতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করেছে এবং তারা পবিত্র বাইবেলের উর্দূ অনুবাদে 'বিশ্রাম নিয়েছেন'কে 'বিরত হয়েছেন' কথায় পরিবর্তন করেছে। তা সত্ত্বেও কিং জেমসের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী বাইবেলে (And he rested on seventh day) কথাটি স্পষ্ট বর্তমান আছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহুদীরা ফিলাডেলফিয়া থেকে যে অনুবাদ প্রকাশ করেছে তাতেও একথাটি আছে। আরবী অনুবাদেও فَاستراح فى اليوم السابع কথাটি আছে।

৫১. এটাই সেই পন্থা যার মাধ্যমে মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য আন্দোলনে মর্মান্তিক ও নিদারুণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার এবং নিজের চেষ্টা–সাধনার সুফল অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সারা জীবন ন্যায় ও সত্যের বাণী সমুন্নত করার এবং পৃথিবীকে কল্যাণের পথে আহবান জানানোর ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারে। এখানে রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা অর্থ নামায। কুরআন মজীদের যেখানেই প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয়ে থাকে নামায। "সূর্যোদয়ের পূর্বে" ফজরের নামায। "সূর্যাস্তের পূর্বে দু'টি নামায আছে। একটি যোহরের নামায এবং অপরটি আসরের নামায" রাতে আছে মাগরিব ও এশার। তাছাড়া তৃতীয় আরেকটি নামায হিসেবে তাহাজ্জুদের নামাযও রাতের তাসবীহর অন্তরভুক্ত। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা বানী ইসরাঈল, টীকা ৯১ থেকে ৯৭ পর্যন্ত। ত্বাহা, টীকা ১১১; আর রূম, টীকা ২৩ ও ২৪। তাছাড়া সিজদা শেষ করার পরে যে তাসবীহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার অর্থ

নামাযের পরের যিকরও হতে পারে এবং ফরযের পরে নফল নামায আদায় করাও হতে পারে। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত হাসান ইবনে আলী, হযরত আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, শা'বী, মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বাসরী, কাতাদা, ইবরাহীম নাখয়ী' ও আওযায়ী এর অর্থ বলেছেন মাগরিবের পরের দু' রাকআত নামায। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস এবং অপর একটি রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ধারণাও এই যে, এর অর্থ নামাযের পরের যিকর। ইবনে যায়েদ বলেন, একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরযের পরেও নফল আদায় করা হোক।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার গরীব মুহাজিররা এসে বললো হে আল্লাহর রাসূল, বড় বড় মর্যাদা তো বিত্তবান লোকেরাই লুফে নিল। নবী (সা) বললেন ঃ কি হয়েছে? তারা বললো ঃ আমরা যেমন নামায পড়ি বিত্তবান লোকেরাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে। কিন্তু তারা দান করে আমরা দান করতে পারি না এবং তারা ক্রীতদাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজ বলে দেব, যা করলে তোমরা অন্য লোকদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে? তবে যারা সে কাজটিও করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে। সে কাজটি হচ্ছে তোমরা প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার করে 'সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলো। কিছুদিন পরে তারা এসে বললো, এ আমলের কথা আমাদের বিত্তবান ভাইয়েরাও শুনেছে এবং তারাও এ আমল করতে শুরু করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء । একটি রেওয়ায়াতে এ তাসবীহর সংখ্যা ৩৩ বারের পরিবর্তে দশবার করে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে বলেছিলেন। পরে এক আনসারী বলেছিলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি কেউ যেন আমাকে বলছে যদি তুমি এ তিনটি তাসবীহ ২৫ বার করে পড় এবং তারপর ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় তাহলে অধিক উত্তম হবে। নবী (সা) বললেন ঃ ঠিক আছে, সেভাবেই করতে থাকো। (আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে বসতেন তখন আমি তাঁকে এ দোয়া পড়তে শুনতাম ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (احكام القران للجصاص)

এ ছাড়াও নামাযের পরবর্তী যিকরের আরো কতিপয় পন্থা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। যারা কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে আমল করতে ইচ্ছুক তারা যেন হাদীসগ্রন্থ মিশকাতের আয যিকর বা'দাস সালাত অনুচ্ছেদ থেকে নিজের সবচেয়ে মনমত একটি দোয়া বেছে নেয় এবং সেটি আমল করে।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

আর শোনো যেদিন আহবানকারী (প্রত্যেক মানুষের) নিকট স্থান থেকে আহবান করবে,[৫২] যেদিন সকলে হাশরের কোলাহল ঠিকমত শুনতে পাবে,[৫৩] সেদিনটি হবে কবর থেকে মৃতদের বেরুবার দিন। আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই। এবং আমার কাছেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে সেদিন—যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, এবং লোকেরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর কদমে ছুটতে থাকবে, এরূপ হাশর সংঘটিত করা আমার নিকট খুবই সহজ।[৫৪] হে নবী ! ওরা যেসব কথা বলে, তা আমি ভালো করেই জানি,[৫৫] বস্তুত তাদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে আনুগত্য আদায় করা তোমার কাজ নয়। কাজেই তুমি এ কুরআন দ্বারা আমার হুশিয়ারীকে যারা ডরায়, তাদেরকে তুমি উপদেশ দাও।[৫৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বর্ণিত দোয়ার চাইতে ভাল দোয়া আর কি হতে পারে? তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, দোয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কিছু শব্দ মুখে উচ্চারণ করাই নয়। বরং ঐ সব শব্দে যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে মন–মগজে তা দৃঢ় ও বদ্ধমূল করা। তাই যে দোয়াই করা হোক না কেন ভাল করে তার অর্থ বুঝে নিতে হবে এবং তা মনে রেখেই দোয়া পড়তে হবে।

৫২. অর্থাৎ যেখানেই যে ব্যক্তি মরে পড়ে থাকবে কিংবা পৃথিবীতে যেখানেই তার মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল সেখানেই তার কাছে আল্লাহর ঘোষকের এ আওয়াজ পৌছবে যে, উঠ এবং তোমার রবের কাছে হিসেব দেয়ার জন্য চলো। এ আওয়াজ হবে এমন যে, ভূপৃষ্ঠের আনাচে–কানাচে যেখানেই যে ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠবে সেখানেই সে মনে করবে যে, আহবানকারী নিকটেই কোথাও থেকে তাকে আহবান করেছে। একই সময়ে গোটা পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে এ আওয়াজ শোনা যাবে। এ থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায় যে, আখিরাতের স্থান ও কাল বর্তমানে আমাদের এ পৃথিবীর স্থান ও কালের তুলনায় কতটা পরিবর্তিত হবে এবং সেখানে কেমন সব শক্তি কি ধরনের আইনানুসারে তৎপর ও সক্রিয় থাকবে।

৫৩. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সমস্ত মানুষই মহাসত্য সম্পর্কিত আহবান শুনতে পাবে। অপর অর্থটি হচ্ছে হাশরের কলরব ঠিকমতই শুনতে পাবে। প্রথম অর্থ অনুসারে বক্তব্যের সারমর্ম দাঁড়ায়, মানুষ নিজ কানে সেই মহাসত্যের আহবান শুনতে পাবে যা তারা পৃথিবীতে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, যা অস্বীকার করতে তাদের ছিল চরম একগুঁয়েমী এবং যার সংবাদদাতা নবী–রসূলদের তারা বিদ্রূপ করতো। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এর প্রতিপাদ্য বিষয় দাঁড়ায় এই যে, নিশ্চিতভাবেই তারা হাশরের কলরব–কোলাহল শুনবে, তারা নিজেরাই জানতে পারবে, এটা কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং প্রকৃতই হাশরের কলরব–কোলাহল। ইতিপূর্বে তদেরকে যে হাশরের খবর দেয়া হয়েছিলো তা যে সত্যিই এসে হাজির হয়েছে এবং এই যে তারই শোরগোল উত্থিত হচ্ছে সে ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহই থাকবে না।

৫৪. তিন নম্বর আয়াতে কাফেরদের যে কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে এটা তারই জবাব। তারা বলতো, আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো তখন আমাদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে তা কি করে হতে পারে! এভাবে পুনরুত্থান তো অসম্ভব ও অযৌক্তিক। তাদের এ বক্তব্যের জবাবে বলা হয়েছে, এ হাশর অর্থাৎ একই সময়ে আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে জীবিত করে একত্রিত করা আমার জন্য একেবারেই সহজ। কোন ব্যক্তির মাটি কোথায় পড়ে আছে তা জানা আমার জন্য আদৌ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এসব বিক্ষিপ্ত অণু–পরমাণুর মধ্যে কোন্‌গুলো যায়েদের আর কোন্‌গুলো বকরের তা জানতেও আমার কোন কষ্ট হবে না। এসব অণু–পরমাণুকে আলাদাভাবে একত্রিত করে একেকজন মানুষের দেহ পুনরায় তৈরী করা এবং ঐ দেহে হুবহু আগের ব্যক্তিত্ব নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া আমার জন্য কোন শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং আমার একটি মাত্র ইংগিতেই তৎক্ষণাৎ তা হতে পারে। আদমের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আমার একটি মাত্র আদেশে তারা সবাই অতি সহজে সমবেত হতে পারে। তোমাদের অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি–বিবেক একে অসম্ভব মনে করলে মনে করুক। বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টার ক্ষমতার কাছে তা অসম্ভব নয়।

৫৫. এ আয়াতাংশে যুগপৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সান্ত্বনা এবং কাফেরদের জন্য হুমকি বিদ্যমান। নবীকে (সা) উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে যে, এসব লোক তোমার বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা রটনা করছে মোটেই তার পরোয়া করো না। আমি সবকিছু শুনছি। তাদের সাথে বুঝা পড়া করা আমার কাজ। কাফেরদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আমার নবীর বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রূপাত্মক উক্তি করছো সে জন্য তোমাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হবে। আমি নিজে প্রতিটি কথা শুনছি। তোমাদেরকে তার মাশুল দিতে হবে।

৫৬. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর করে নিজের কথা মানুষকে মানাতে চাইতেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাঁকে বিরত রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবীকে (সা) সম্বোধন করে কাফেরদের একথা শুনানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের কাছে আমার নবীকে শক্তি প্রয়োগকারী করে পাঠানো হয়নি। তোমাদেরকে জোর করে মু'মিন বানানো তার কাজ নয় যে, তোমরা মানতে না চাইলেও

তিনি তোমাদেরকে তা মানতে বাধ্য করবেন। তাঁর দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে, সাবধান করে দিলে যারা সতর্ক হয়ে যাবে তিনি তাদেরকে কুরআন শুনিয়ে প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে দেবেন। এরপরও যদি তোমরা না মানো তাহলে নবী তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন না, বরং আমি নিজে তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবো।